বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাস : রাজনীতি ও মানুষের জীবন-কথা

ড. অনন্য ভট্টাচার্য
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, হুগলি মহসিন কলেজ, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ

ABSTRACT (মূল নিবন্ধের সংক্ষিপ্তসার) : সাধারণ উপন্যাসের তুলনায় রাজনৈতিক উপন্যাসের বিষয়, বিন্যাস ও প্রকৃতিগত পার্থক্য রয়েছে। রাজনৈতিক উপন্যাস প্রথমত উপন্যাস, দ্বিতীয়ত তা রাজনৈতিক। অর্থাৎ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মানুষের জীবন কাহিনির বর্ণনাই রাজনৈতিক উপন্যাসের প্রাথমিক লক্ষ্য। রাজনৈতিক উপন্যাসে শুধু রাজনৈতিক তত্ত্ব-দর্শন-চিন্তাচেতনা কিংবা বিশেষ কোনো দলের রাজনৈতিক কর্মসূচি বা আদর্শের কথাই থাকে না। রাজনৈতিক বিষয় ও বক্তব্যের মধ্য দিয়ে মানবজীবনের গোপন মর্মস্পন্দনকে ফুটিয়ে তোলাই এর প্রধান কাজ। বাংলা সাহিত্যে প্রকৃত রাজনৈতিক উপন্যাসে রাজনীতির সঙ্গে মানুষ ও মানবজীবন কতখানি গভীর ভাবে সম্পৃক্ত তাই চিত্রিত হয়েছে।

KEY NOTE ADDRESS (বক্তব্য বিষয়ের সংকেত সূত্র) : রাজনীতির আদি উৎস হল মানুষ। রাজনীতির প্রকৃত উদ্দেশ্য হল মানবকল্যাণ ও মানবসত্যের পথ সম্প্রসারিত করা। ঔপন্যাসিক যখন নিজস্ব রাজনৈতিক অভিজ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ, মানবতা ও রাজনীতিকে সমগুরুত্বদানের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক উপন্যাস রচনা করেন তখনই তা হয় সার্থক রাজনৈতিক উপন্যাস। রাজনৈতিক সত্য ও মানবসত্যের যুগলবন্দিতেই রাজনৈতিক উপন্যাসের সার্থকতা।

MAIN ARTICLE (মূল প্রবন্ধ) : ১৮৮২ সালে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসটি যে সেই সময়ে প্রচলিত প্রথাগত উপন্যাসের ধরণ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা তা বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছিলেন। পাঠককে সতর্ক করে বলেছিলেন, তাঁরা যেন এই বইটিকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে ভুল না করেন। বইটি প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্যকে সম্প্রসারিত করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র আরও বলেন যে, ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। এটা আমাদের জানা যে, উপন্যাসের আকার বা মডেল শুধু নয়, উপন্যাসের নানাবিধ শ্রেণিও নির্মাণ করেছিলেন বঙ্কিম নিজেই। পারিবারিক, সামাজিক, ইতিহাস-আশ্রিত রোমান্স কিংবা খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস তো তিনিই সৃষ্টি করেছেন। ১৮৮২-র আগে যাবতীয় উপন্যাসগুলির সব কটিই কোন না কোনোভাবে এই শ্রেণি বা গোত্রভুক্ত। কিন্তু 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের বক্তব্য, বয়ান, নামকরণে অষ্টাদশ শতকের ঐতিহাসিক সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ও মন্বন্তরের প্রেক্ষাপট থাকলেও এই উপন্যাসকে কোনোভাবেই কেবলমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে নির্দিষ্ট করা যায় না।

আসলে এই উপন্যাসের রেটরিকে বঙ্কিমচন্দ্র সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের বিরুদেধ আপসহীন লড়াইয়ের কথা বলে পরাধীনতার শিকল থেকে দেশমাতৃকাকে উদ্ধারের যে ভাষ্য নির্মাণ করেছেন, তার মধ্য দিয়ে উপন্যাসটি এক স্বতন্ত্র বক্তব্য ও শৈলী নিয়ে পাঠকের কাছে হাজির হয়েছে। পাঠক তাঁর উপন্যাস পাঠের পূর্ব অভিজ্ঞতা দিয়ে এই উপন্যাসটির শ্রেণিবিচার করতে পারেননি সেকালের সেই সময়ে। এমনকি বঙ্কিম নিজেও এই উপন্যাসটির শ্রেণি নির্ধারণ করে কোনও বিশেষণ আরোপ করেননি। কিন্তু উপন্যাসের ভূমিকা অংশে তাঁর বক্তব্যটি বুঝিয়ে দেয় 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের গোত্র বা শ্রেণি সম্পূর্ণ আলাদ।১

অনেক পরে এই উপন্যাসটিকে রাজনৈতিক উপন্যাসের শ্রেণিভুক্ত করেছেন কেউ কেউ। তাঁরা বলতে চেয়েছেন 'যবন' বা 'বৃটিশ' বিরোধিতার মধ্য দিয়ে আসলে যে জাতীয় চেতনা বা রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ হয়েছিল, অত্যাচারী শাসকের বিরুদেধ দেশজোড়া যে গণবিক্ষোভ ও আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল, তার সূতিকাগার ছিল 'আনন্দমঠ'। সুতরাং সাহিত্যের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টিকারী 'আনন্দমঠ' উপন্যাসই বাংলার প্রথম রাজনৈতিক উপন্যাস। যদিও এই মত সর্বাংশে মানা যায় না। কারণ, রাজনৈতিক উপন্যাসের শ্রেণিচরিত্র বোঝা বা পাঠের জন্য যে পরিণত ও স্পষ্ট রাজনৈতিক চেতনা বা মতাদর্শ থাকা প্রয়োজন, ঊনবিংশ শতাব্দীর জনসমাজের মধ্যে তা ছিল না। একজন অসামান্য মনীষী ও তীক্ষ্ণধী লেখক

বঙ্কিম পাশ্চাত্যভাবনায় পুষ্ট হয়ে ইতিহাস ও সমকালের গতিপ্রকৃতি অনুধাবন করে তাঁর নিজস্ব বোধ ও উপলব্ধির সাযুজ্যে সমকালের রাষ্ট্রিক সামাজিক প্রেক্ষিত থেকে এক ভিন্ন মাত্রার রাজনৈতিক চেতনা অর্জন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক বোধ ও চেতনা শেষ পর্যন্ত হিন্দুত্ববাদী সংকীর্ণ ভাবনার স্রোত বেয়ে এক বিপজ্জনক খাদের দিকে এগিয়ে গেছে। ভারতীয় জনসমাজের অন্যতম অংশ মুসলমানদের বাদ দিয়ে কিংবা তাদের ধর্মচেতনায় আঘাত করে আসলে ঐক্যবদ্ধ ভারতীয় জাতি গঠনের স্বপ্ন যে অধরাই থেকে যাবে, এই সহজ সত্য বুঝেও নিজের হিন্দুত্ববাদী গোঁড়ামি ত্যাগ করতে পারেননি। ফলে যে 'আনন্দমঠ' হয়ে উঠতো জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে ভারতীয় জনসমাজের সর্বাত্মক জাগরণের প্রেরণাস্বরূপ, তা শেষ পর্যন্ত এক বিশেষ ধর্মের মহত্ব প্রচার এবং অন্য এক ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশের এক ভাষ্য হয়েই থেকে গেল।

মূলত যবন-বিরোধিতা, মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি তাচ্ছিল্যসূচক অবমাননাকর উক্তি, হিন্দুত্ববাদী সংকীর্ণ মানসিকতা এই বিষয়গুলিই শেষ পর্যন্ত 'আনন্দমঠ'-কে একটি যথাযথ ও সার্থক রাজনৈতিক উপন্যাস হতে দেয়নি। রাজনৈতিক উপন্যাস সৃষ্টির জন্য যে রাজনৈতিক বোধ, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও জনসমাজের গঠন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকার প্রয়োজন, তার সবকটিই ছিল এই অনন্য প্রতিভাধর ঔপন্যাসিকের মধ্যে। কিন্তু উপন্যাসে দেশের মুক্তির জন্য নব্য হিন্দুত্ববাদী তত্ত্বের প্রয়োগ ভাবনা কার্যকর করতে গিয়ে আসলে একটি রাজনৈতিক উপন্যাসের হয়ে ওঠার সম্ভাবনাকে নষ্ট করে ফেললেন তাঁর সংকীর্ণ ও ভ্রান্ত জাতীয়তাবাদী মানসিকতার জন্য।

ভারতীয় সমাজ ও সভ্যতার মূল স্পিরিট, তার জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে যে সমন্বয়বাদী চরিত্র বা স্বভাব, তাকে গুরুত্ব না দিয়ে একটি বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়কে বিচ্ছিন্ন করে দেখার প্রয়াসে আসলে ভুল রাজনীতির বিপজ্জনক ফাঁদে পা দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেন। তাঁর এই ব্যর্থতা আসলে দেখায় রাজনৈতিক উপন্যাস মানে শুধুমাত্র পাঠকের মনে রাজনৈতিক উত্তেজনা সৃষ্টি করা নয়। রাজনৈতিক সত্য আর মানবসত্যকে উপেক্ষা করলে ঔপন্যাসিকের রাজনৈতিক ভাবনা, আদর্শের মধ্যেও যেমন ফাঁক থেকে যাবে, তেমনি রাজনৈতিক উপন্যাস সৃষ্টিও সর্বাংশে সফল হবে না।

মনে রাখা দরকার, রাজনীতির মূল লক্ষ্য মানবতার বিকাশ ও সম্প্রসারণ। বিশ্বের যে কোন রাজনৈতিক তত্ত্ব ও দর্শনের আদি ভিত্তি গড়ে উঠেছে মানবমঙ্গল ও কল্যাণের লক্ষ্য নিয়ে। ফলে রাজনৈতিক দল ও দলীয় কর্মসূচি যদি শেষ পর্যন্ত মানবিকতার পরিপন্থী হয় তবে সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক সত্য বা মানবসত্যের কথা মনে করিয়ে দেওয়া ঔপন্যাসিকের বিশেষ দায় হয়ে ওঠে। বৃহত্তর অংশের মানুষের কল্যাণের জন্য রাজনীতির যে সদর্থক ও ইতিবাচক ভূমিকা হওয়া উচিত তাকে তুলে ধরাও ঔপন্যাসিকের দায়। রাজনীতি এক মহৎ সত্যের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে কীভাবে মানুষ, সমাজ, দেশ ও জাতীয় জীবনকে পূর্ণতার সন্ধান দেয়, সেই বার্তা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক উপন্যাসের মধ্যেও আমরা পেয়েছি।

আমাদের দেশে, বিশেষত বাংলায়, যথার্থ রাজনৈতিক উপন্যাস সৃষ্টি হয়নি অনেকদিন পর্যন্ত। ১৯১৬-তে রচিত রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসই প্রথম রাজনৈতিক উপন্যাস। তার আগে রচিত বিভিন্ন উপন্যাসে রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা, রীতিনীতি, ইংরেজ-বিরোধী গণবিক্ষোভের উল্লেখ থাকলেও তা শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক উপন্যাস হয়ে ওঠেনি। আসলে যে কোন উপন্যাসে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ, ঘটনা, রাজনৈতিক দল, আদর্শ, তত্ত্ব, কর্মসূচি প্রভৃতি বিষয় থাকতেই পারে। কিন্তু এইসব কিছুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও মন্থনের মধ্য দিয়ে মানুষ ও মানবসভ্যতার মধ্যে রাজনীতির কোনও বড়ো প্রভাব পড়েছে কিনা কিংবা মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির আমূল রূপান্তর ঘটে গিয়ে ইতিহাসের গতিধারাকে পরিবর্তনের জন্য নতুন রাজনৈতিক চেতনার জন্ম হচ্ছে কিনা— এই বিষয়গুলিকেই রাজনৈতিক উপন্যাসের লেখক চিহ্নিত করেন। আর তিনি তা করেন দেশ-কাল-ইতিহাস সম্পর্কে, মানুষ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সুষম সমন্বয়ে। অন্যথায় উপন্যাসকে তিনি যদি সংকীর্ণ দলীয় মতবাদের বা কর্মসূচির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন তাহলে তাঁর রচনায় রাজনৈতিক প্রসঙ্গ এলেও শেষমেষ কখনই তা রাজনৈতিক উপন্যাস হবে না।

দলীয় রাজনৈতিক কর্মসূচি যদি সাধারণ গরিব মানুষের স্বার্থের পরিপন্থী হয়, তবে রাজনীতি সম্পর্কেও মানুষের মনে সন্দেহ ও অবিশ্বাস তৈরি হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যও স্থান পেয়েছে 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে। বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষিতে স্বদেশি আন্দোলনের কালে গরিব ও সাধারণ মানুষের দোকান থেকে জোর করে পণ্যসামগ্রী ছিনিয়ে নিয়ে এসে যে বহ্ন্যুৎসব— তাকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন তিনি। রাজনীতির নাম করে অমানবিক কার্যকলাপ ও গরিব মানুষের মধ্যে ভয়ভীতি জাগিয়ে তোলার এই প্রচেষ্টাকে কখনই যে তিনি মেনে নেননি তার স্পষ্ট প্রমাণ দেখি নিখিলেশের কথায়। ভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনগুলি শেষ

পর্যন্ত যুগের সংকটকে মোকাবিলা করার পরিবর্তে হুজুগের আন্দোলনে পরিণত হচ্ছে— এটাই ছিল তাঁর ক্ষোভের কারণ।

কিন্তু তা বলে রাজনীতি মানেই ক্লিন্ন ও মন্দ এমন কোন সরল সিদ্ধান্তে উপনীত হননি কখনো রবীন্দ্রনাথ। বরং 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে এসেছে সেই রাজনৈতিক সত্যের কথা যা তিনি নিজে বিশ্বাস করতেন অন্তর থেকে। তা হলো— অশিক্ষা, নিরক্ষরতা, অজ্ঞানতা, অন্ধবিশ্বাস, জাতপাতের বৈষম্য দূর না হলে দেশকে দেশ বলে আমরা ভাবতে পারবো না কেউ। সামাজিক সংস্কারে আবদ্ধ আমাদের চৈতন্য ও বিবেকের মুক্তি না ঘটলে দেশের প্রকৃত মুক্তি সম্ভব নয়। এমনকি ইংরেজ বিতারণেও দেশের মুক্তি আসবে না, যদি না দেশবাসী সব রকমের সামাজিক নাগপাশ ছিন্ন করে শুধুমাত্র মানুষ হিসেবে পরস্পরকে ভাবতে পারে। এই আত্মোপলব্ধি ও আত্মসচেতনার যে বার্তা 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে রয়েছে তা প্রথাগত রাজনৈতিক চিন্তাচেতনার অনেক ঊর্ধ্বে থাকা মানবসত্যকে স্পষ্ট করতে পেরেছে। এই কারণেই 'ঘরে বাইরে' একটি রাজনৈতিক উপন্যাস শুধু নয়, একটি মহৎ উপন্যাসও বটে। বস্তুত উপন্যাসের মধ্যে রাজনৈতিক চিন্তার সততা না থাকলে তা রাজনৈতিক উপন্যাস হবে না— এই ধারণা রবীন্দ্রনাথ থেকেই পাওয়া।

একজন লেখক অবশ্যই বিশেষ কোন রাজনৈতিক দলের কর্মী বা সমর্থক হতে পারেন। কিন্তু তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও পর্যবেক্ষণে যদি নতুন কোনও সামাজিক দ্বন্দ্ব ও পরিবর্তনের ছবি আসে, এমনকি নতুন কোনও রাজনৈতিক চিন্তাধারা যদি জনজীবনে আলোড়ন সৃষ্টি করে, যা তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক আদর্শ ও বিশ্বাসের বিপ্রতীপ, সেই রাজনৈতিক ভাবনাকেও সততার সঙ্গে চিত্রিত করা একজন সৎ ঔপন্যাসিকের কাজ। এই রাজনৈতিক সত্য চিত্রণের ক্ষেত্রে অনেক সময়েই পূর্বেকার রাজনৈতিক বিশ্বাসের সঙ্গে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হতে পারে। 'জাগরী' উপন্যাসে কারাগারে বন্দি থাকাকালীন সময়কালের রাজনীতির সঙ্গে নিজের দলের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের সঙ্গে বিলুর প্রবল মতপার্থক্য তৈরি হয়েছে শুধু তাই নয়, নিজের দলের প্রতি এক ধরণের সংশয় ও অবিশ্বাসও তাকে কুরে কুরে খেয়েছে। 'জাগরী'র স্রষ্টা সতীনাথ ভাদুড়ি ছিলেন কংগ্রেস সোসালিস্ট দলের সদস্য। জেলে বন্দি থাকাকালীন নিজের দলের রাজনৈতিক পন্থা ও কর্মসূচি সম্পর্কে তাঁর সন্দেহ ও অবিশ্বাস তৈরি হয়। তারই প্রকাশ দেখি বিলুর জবানিতে।

এক সময়ে সক্রিয়ভাবে গান্ধীবাদী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকা শরৎচন্দ্রের মনেও কংগ্রেসি রাজনীতি সম্পর্কে কিছু মৌলিক অস্বস্তিকর প্রশ্ন তৈরি হয়েছিল। গান্ধীবাদী অহিংস রাজনীতিতে যে তিনি আর আস্থা রাখতে পারছেন না, তার স্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছিল 'পথের দাবী' উপন্যাসে। সতীনাথ ভাদুড়ি ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দুই লেখকই কিন্তু দলীয় রাজনীতির শৃঙ্খল ভেঙে এক ব্যাপ্ত উদার রাজনীতিকে খোঁজার চেষ্টা করেছেন। যে রাজনীতির আদি উৎস মানুষ। যে রাজনীতি সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির জন্যে মানুষকে বিভ্রান্ত করে ভুল পথে চালিত করে— সেই ভুল রাজনীতির বিরোধিতা করেছেন দুজনেই।

আলোচনাটা শেষ করা যায় সমরেশ মজুমদারের 'কালবেলা' উপন্যাসের উল্লেখে। উপন্যাসের নায়ক সত্তরের দশকে সমাজবিপ্লবের স্বপ্নে বিভোর অনিমেষ একসময় বুঝেছিল বিপ্লবের নামে যা কিছু হয়েছে তা আসলে হঠকারিতারই নামান্তর। আসলে গণদেবতাকে বাদ দিয়ে প্রকৃত বিপ্লব কখনই সম্ভব নয়। কারণ জনবিচ্ছিন্ন রাজনীতি কখনোই শেষ পর্যন্ত সফল হয় না। অনিমেষের এই ভাবনায় আমাদের দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের সাফল্য ও ব্যর্থতার একটি স্পষ্ট কারণ উল্লিখিত হয়েছে। তা হল, মানুষই রাজনীতির উৎস ও নিয়ন্ত্রক। মানুষই মহাকালের রথের ঘোড়া। মানুষকে বাদ দিলে কিংবা মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে যে কোন রাজনৈতিক প্রচেষ্টাই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হতে বাধ্য। যে রাজনীতি ও রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মানবতা ও মানবকল্যাণের পথ প্রশস্ত হয় সেই রাজনীতিই মহৎ ও সত্য। কারণ রাজনীতির চেয়ে বড়ো মানুষ ও মানুষের জীবন। তাই রাজনৈতিক সত্য ও মানবসত্যের যথাযথ প্রকাশের মধ্য দিয়েই সৃষ্টি হতে পারে প্রকৃত রাজনৈতিক উপন্যাস।

REFERENCE (তথ্যসূত্র) :

১. দাশ শিশির, ভারতীয় রাজনৈতিক উপন্যাস : প্রাক স্বাধীনতা পর্ব, অনুষ্টুপ, শারদীয় ১৯৯৩, কলকাতা, পৃ. ১৮

REFERENCE BOOK (সহায়ক গ্রন্থ) :

১. ভট্টাচার্য বিশ্ববন্ধু, বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসের কয়েকটি পর্যায়, প্রথম প্রকাশ, ১ম সংস্করণ, মনীষা, কলকাতা, ১৯৯০
২. বন্দ্যাোপাধ্যায় পার্থপ্রতিম, উপন্যাস রাজনৈতিক, প্রথম প্রকাশ, ১ম সংস্করণ, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ১৯৯১